ছোটদের মহাভারত

ছোটদের মহাভারত

শ্রী মনোরম গুহ ঠাকুরতা
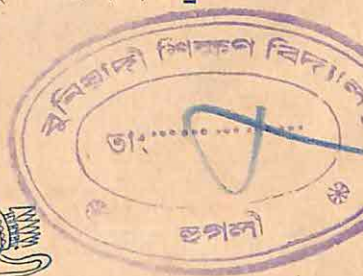
[যুক্তাক্ষর বর্জিত]
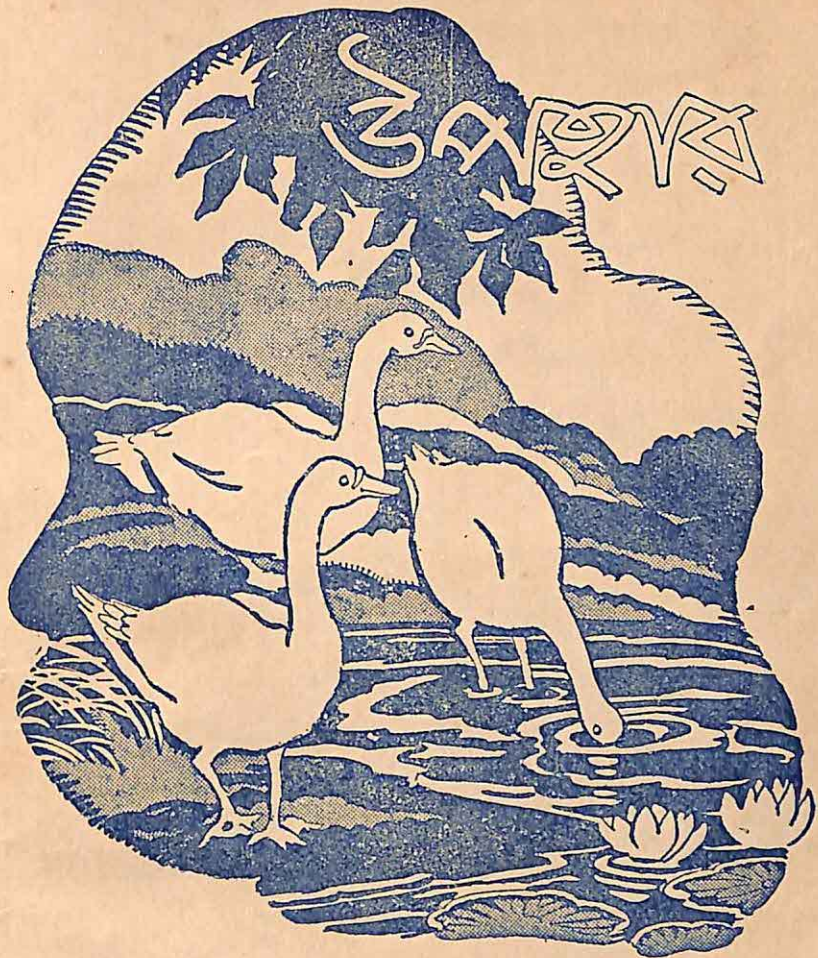
সে অনেক—অনেক কাল আগের কথা।
খুব কম করে হলেও চার পাঁচ হাজার বছর হবে।
আমাদের দেশের রা জ ধা নী দিললী শহরের কথা তোমরা

জানো। এই শহরের খুব কাছেই তখন একটা দেশ ছিল। সে দেশের নাম ছিল হসতিনাপুর। সে দেশের রাজার দু' ছেলে ছিল। সাধারণ নিয়মে রাজার বড় ছেলেই রাজা মরবার পর রাজা হয়। এখানে তা হলো না। রাজা মারা গেলে ছোট ছেলে হলেন রাজা। কারণ বড় ছেলে ছিলেন কাণা। দু' চোখেই তিনি কিছু দেখতে পেতেন না।

ছোট ছেলের নাম পানডু। পানডু রাজা হয়ে বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন।

পানডুর ছেলেরা তখন ছোট। পানডুর পরে ত তাদেরই রাজা হবার কথা। এখন কথা হলো যে অতটুকু সব ছেলে দেশ শাসন করবে কি করে? পানডুর সেই কাণা দাদা তখনো বেঁচে ছিলেন। তিনি বললেন, ওদের হয়ে আমিই দেশ শাসন করবো। তারপর ওরা বড় হলে সব বুঝেশুনে নেবে।

পানডুর ছেলে ছিল পাঁচটি আর তাঁর দাদার ছেলে ছিল এক শ' জন।

পানডুর ছেলেদের বলা হ'ত পানডব। এরা যে বংশের লোক সে বংশের নাম ছিল কুরু। তাই বড় ভাইয়ের ছেলেদের বলা হ'ত কৌরব।

পানডবেরা সবাই বেশ ভালো ছেলে ছিলেন। এঁদের পাঁচ জনার নাম ছিল—যুধিষঠির, ভীম, অরজুন, নকুল, সহদেব।

কৌরবেরা কেউই ভালো ছেলে ছিল না। যেমনি এরা মানুষ তেমনি ওদের নাম। নামগুলো কি সব—কারও নাম দুরযোধন, আবার কারও নাম দুঃশাসন—এমনি সব।

পানডবদের গুণ ছিল অনেক। যেমন ছিলেন তাঁরা লেখাপড়ায় ভালো—তেমনি তাঁরা পাকা হয়ে উঠেছিলেন লড়াইতেও। রাজার ছেলেদের ত এসব গুণই থাকা খুব বেশী দরকার কি না! যুধিষঠিরের মত সাধু আর সৎ, ভীমের মত জোয়ান, আর অরজুনের মত তীর ছোড়ায় পাকা সে যুগে কেউ ছিল না বললেই চলে! আর ছোট দু' ভায়েরও গুণ ছিল অনেক।

কৌরবেরা ছিল ভারী বদ! সব সময় শুধু খারাপ কাজ নিয়েই ওরা থাকতো। কাকে গালাগাল দেবে, কাকে মারধর করবে—এ সবই ছিল ওদের সব সময় ভাবনা। দেশের মানুষেরা তাই ওদের ভারী ভয় করে চলতো। ওদের কেউ ভালোবাসতো না। খারাপ যারা তাদের এ রকম দশাই হয় কি না!

দেশের লোকের মুখে মুখে সব সময়েই শোনা যেতো পানডবদের গুণগান। তারা সকলেই বলতো —ওদের মত ছেলে হয় না। ওরা যেমনি লেখাপড়ায় ভালো, তেমনি পাকা লড়াইতে। রাজরাজড়ার ছেলেদের যেমন হওয়া দরকার, তাই ওরা হয়েছে।

এসব কারণে কৌরবেরা পানডবদের ভারী হিংসা করতো। করলে কি হবে, ওদের কোন গুণ থাকলে ত মানুষে ওদের ভালো বলবে।

তবে জেঠামশাই পানডবদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময়েই দেখতেন, ওরা যাতে ভালো হয়।

বাবা পানডবদের এতটা করেন—এতটা ভালো-বাসেন—এ-ও কৌরবদের ভালো লাগতো না।

পানডু মারা যাবার পর, কৌরবেরা ভাবলে যে, তাদের বাবা যখন দেশ শাসনের কাজ সুরু করেছেন, তখন তারাই তাদের বাবার পরে দেশের রাজা হতে পারবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলে। তারা বুঝলে যে, তাদের বাবা ত দেশের রাজা হননি, তিনি শুধু পানডবদের হয়ে দেশ শাসন করছেন।

এ কথা বুঝতে পারার পর থেকেই পানডবদের ওপর তাদের রাগ আরও বেড়ে গেলো। তখন থেকে তারা ভাবতে লাগলো, কি করে পানডবদের নাকাল করবে। ওরা ভাবলে, যদি নাকাল করতে গিয়ে ওদের খুনও করতে হয়, তবু তারা পিছ-পা হবে না।

ভীমের গায়ে খুব বেশী জোর, ওরা কেউ ভীমকে এঁটে উঠতে পারতো না। তাই ভীমকেই ওরা হিংসা করতো সব চেয়ে বেশী। ওরা ভাবলে যে, ওকেই সবার আগে শেষ করবে। মনে মনে এই ঠিক করে ভীমকে কোন রকমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওরা একবার বিষ খাওয়ালে। হায়! হায়! কি

করতে কি হলো ! বিষ খেয়ে ভীমের গায়ের জোর যেন আরও বেড়ে গেলো। এ দেখে ত ওদের মুখ থেকে আর কথা সরে না। ফলে, হিংসা ওদের বেড়েই চললো।

এর পর হলো আর এক ঘটনা।

কৌরব আর পানডবদের যিনি তীর ছুড়তে শেখাতেন, তাদের সেই গুরুদেব একদিন ওদের বললেন,—দেখো বাপু, তোমরা কে কেমন তীর ছুড়তে শিখেছ, তা আমি একবার পরখ করতে চাই। তিনি বনের ভেতরে একটা গাছের সব চেয়ে উপরের ডালে একটা মাটির তৈরী পাখি রেখে বললেন, পাখিটার চোখ তীর দিয়ে বিঁধতে হবে।

এক এক করে সব রাজকুমারই এগিয়ে এলেন তীর ধনুক নিয়ে পাখির চোখ বিঁধতে। সবাই তীর ছুড়লেন, তবে কেউই পারলেন না। শেষে এলেন অরজুন।

গুরুদেব তাকে বললেন—তুমি কি পাখিটাকে দেখছো ?

তিনি জবাব দিলেন—হা, গুরুদেব আমি দেখছি।

গুরুদেব আবার বললেন—পাখিটাকেই শুধু দেখছো, না গাছটাছ আর কিছু দেখছো?

অরজুন বললেন—না গুরুদেব, আমি শুধু পাখিটাকেই দেখছি।

তিনি আবার বললেন—পাখির সবটাই কি তুমি দেখছো?

তিনি জবাব দিলেন—এখন আমি শুধু পাখিটার চোখই দেখছি।

গুরুদেব বললেন—তবে এখন তুমি তীর ছোড়।

অরজুন তীর ছুড়লেন। তীর গিয়ে পাখির চোখে লাগলো।

গুরুদেব তখন রাজকুমারদের বললেন—এ রকম মনোযোগ না থাকলে তীর ছোড়ায় কেউ পাকা হতে পারে না। শুধু তাই নয়, যে কোন কাজে সফল হতে হলেই এ রকম মনোযোগ থাকা দরকার।

এ ঘটনার পর পানডবদের ওপর কৌরবদের রাগ আরও বেড়ে গেলো। রাগই যে শুধু বাড়লো তা

নয়। এখন থেকে ওরা ওদের বেশ ভয়ও করতে সুরু করলে।

কি করে ওদের নাকাল করা যাবে, কি করে মানুষের কাছে ওদের ছোট করা যাবে—তাই নিয়েই ওরা মাথা ঘামাতে লাগলো খুব বেশী করে।

এর ভেতরেই ওদের অনেক খারাপ সব সাথী জুটেছিল। খারাপ লোকের সাথে খারাপ লোকই এসে জোটে। এর ভেতর সব চেয়ে পাজী ছিল শকুনি। শকুনি ওদের মামা। সাথীরা সব বললে—ওদের পুড়িয়ে মারতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। ঠিক হলো যে কৌশল করে ওদের বারণাবতে পাঠানো হবে। বারণাবত একটা শহরের নাম। বেশ ভালো জায়গা। সেখানকার জল-হাওয়াও খুব ভালো। নদীর ধারে শহরটি।

ঐ শহরে গালা দিয়ে একটা ঘর তৈরী করা হবে। গালা যে খুব সহজে পোড়ে একথা তোমরা হয়ত জানো। ঐ গালার ঘরে ওদের থাকবার জায়গা

ঠিক করে দেওয়া হবে। তারপর রাতের বেলা যখন ওরা ঐ ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারা হবে।

ঐ শহরে পুরোচন বলে একটা লোক ছিল। সে কৌরবদের হাতের লোক। এ কাজের ভার তারই হাতে দেওয়া হবে। সেও খুব বদ লোক। তা না হলে কি আর এ রকম কাজের ভার নেয়।

এখন কৌরবদের ঐ বদ সাথীগুলো সব সময়েই পানডবদের বলতে সুরু করলো—তোমরা একবার বারণাবতে গিয়ে বেড়িয়ে এস না কেন। কি চমৎকার জায়গা! যেমনি ভালো দেখতে ওখানকার সব কিছু, তেমনি আবার জল-হাওয়া। সেখানে গেলে দেখবে, দু' দিনেই তোমাদের শরীর কত ভালো হয়ে গেছে। রাজার ছেলেদের ত বটেই সবারই সেখানে একবার যাওয়া উচিত। অমন দেশে একবার না গেলে জীবনই মিছা হয়ে যাবে যে!

রোজ রোজ এসব কথা শুনতে শুনতে ওদের সেখানে যাওয়ার লোভ হলো। শেষটায় ওরা ঠিক

করে ফেললে যে তারা তাদের মা কুনতীকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যাবে।

তারপর একটা দিনও ওরা ঠিক করলেন। বিদুর বলে একজন ভারী সাধু লোক ছিলেন। পানডবদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। তিনি পানডবদের বললেন—তোমরা যেতে চাও, যাও। আমি তোমাদের বাধা দেব না। তবে একটা কথা জানো কি?—তোমাদের আগুনে পুড়ে মরবার যোগ রয়েছে সামনে। তোমরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে চোলো।

পানডবেরা বিদুরের কথা শুনে খুব সাবধান হয়ে গেলেন।

যেভাবে সব ঠিক করা ছিল, সেই ভাবেই পানডবেরা উঠলেন গিয়ে ঐ গালার ঘরে। ঘরের দরজা আটকে ঘরে কেউ আগুন দিলে সহজে যেন বেরিয়ে পড়তে কোন রকম অসুবিধা না হয়, তাই তারা ঘরে একটা সুড়ং আগে থেকেই কেটে রাখবেন ঠিক করলেন। ভীমের গায়ে ত খুব জোর ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি করে বেশ বড় একটা সুড়ং কেটে

ফেললেন যা দিয়ে সহজেই যাওয়া-আসা যায়। সুড়ংএর মুখটা রইলো নদীর দিকে।

যেভাবে সব ঠিক করা ছিল, সেই ভাবেই একদিন রাতের বেলা কৌরবেরা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। আগুন লাগার সাথে সাথেই পানডবেরা মাকে নিয়ে সুড়ং দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কৌরবেরা ভাবলো যে ওরা সবাই পুড়ে মরেছে।

আগে থেকেই একখানা নৌকো ঠিক করা ছিল। ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে সেই নৌকোয় উঠে রাতের আঁধারেই তাঁরা নদীর অপর পারে চলে গেলেন।

—দুই—

বিদুর তাঁদের বলে দিয়েছিলেন—তোমাদের বেশ কিছুদিন খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আমি কৌরবদের ভালো হবার অনেক উপদেশ দিয়েছি। ওরা সে সব কথায় কান দেয় না। আমার মনে হয়, ওরা তোমাদের আরো বেশী নাকাল না করে ছাড়বে না।

বিদুরের কথাগুলো মনে করে নদীর ওপারে গিয়েও ওঁরা খুব গোপনে চলাফেরা করতে সুরু করলেন।

সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়রান হয়ে এক গাছতলায় গিয়ে ওঁরা বসে পড়লেন। ওরা আর চলতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে ভীম বাদে আর সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন সেখানে। বিদেশ বিভূঁই—বলা ত যায় না কখন কি বিপদ ঘটে। তাই রাত জেগে ভীম পাহারা দিতে লাগলেন। এমন সময় একটি মেয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। সে ভীমকে বললে—আর একটু সময়ও আপনারা এখানে থাকবেন না। পালিয়ে যান শীগ্গীর করে। আমরা সবাই নিশাচর। আমার ভাই এখানকার রাজা। আমাদের জাতের পুরুষগুলো মানুষ দেখলেই মেরে ফেলে। আমার ভাই ভারী রাগী। সে যদি আপনাদের দেখতে পায়, তা হলে আপনাদের মেরে খেয়ে ফেলবে।

ভীম হেসে জবাব দিলেন—আমি তোমার ভাইকে একটু দেখতে চাই। তাকে তাড়াতাড়ি করে পাঠিয়ে

দাওগে। আমি তার সাথে একবার লড়াই করে দেখতে চাই।

এর আর কি জবাব দেবে মেয়েটি। সে ভীমের কথা শুনে চুপ করে রইল।

একটু পরেই ত একটা ভীষণ চেহারার নিশাচর সেখানে এসে হাজির।

ভীম ত তাকে দেখেই বলে উঠলেন—কি মশাই! আমার সাথে লড়াই করবার সখ হয়েছে নাকি তোমার!

নিশাচরটা বললে—হা, সখ ত একটু আছেই!

ভীম জবাব দিলেন—তা হলে এক কাজ করো। এখানে ত ওঁরা ঘুমিয়ে আছেন। এখানে লড়াই করলে ওঁদের ঘুম ভেঙে যাবে। চল, একটু দূরে গিয়ে আমরা লড়াই করি।

তাই হলো। নিশাচরটাও ত কম পালোয়ান নয়। তাকে কাবু করতে ভীমের একটু সময় লাগলো। লড়াইতে হারিয়ে ভীম তাকে এক লাথি মেরে একদম শেষ করে দিলেন। ভীম তাঁর বড়দা'র

কথায় মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। মেয়েটির নাম হিড়িম্বা।

সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এক গাঁয়ে এক বামুনের বাড়ী এসে হাজির হলেন। এখানে তাঁরা নিজেদের বামুন বলে পরিচয় দিলেন। মাথায় তাঁদের জটা, মুখ তাঁদের দাড়িগোঁফে ভরা, পরনে গেরুয়া কাপড়—তাও আবার ছেঁড়া।

বাড়ীওয়ালা বামুন দয়া করে তাঁর বাইরের একটা ঘরে তাঁদের থাকবার জায়গা দিলেন। পাঁচ ভাই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে নানা জনের বাড়ী থেকে চাল ডাল চেয়ে আনেন। দিন শেষে ওঁদের মা তাই পাক করেন। তারপর সবাই মিলে ভাগ করে খান। ভীম ত খুব খেতে পারতেন কি না! তাই অত দুটি ভাতে তাঁর চলে না। তিনি ভাতের ফেনটুকুও চো চো করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। এভাবেই এখানে দিন কাটছিল তাঁদের।

ভেবে দেখ কি দুঃখ তাঁদের। রাজার ছেলেদের এমন দুঃখ—এ-ত ভাবাও যায় না। ওঁদের ওই পাজী

জেঠতুত ভাইগুলোই ওঁদের এ দুঃখের কারণ। সাধু ও সৎ লোকের এমন বিপদ সংসারে অনেক সময়েই হয়ে থাকে। তবু এত দুঃখেও ওঁদের মনে সুখের অভাব ছিল না।

আরও কিছু দিন কাটলো সেখানে তাঁদের। একদিন পাঁচ ভাই গাঁয়ের ভেতর ভিখ মাগতে বেরিয়েছেন। এমন সময় মা কুনতী বামুন ঠাকুরের বাড়ীর ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ পেলেন। তিনি ভাবলেন, কার আবার কি হলো বাড়ীর ভেতর। যাই একবার দেখে আসি। ভারী দয়া ছিল তাঁর।

এই ভেবে তিনি বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন—বামুন ঠাকুর, তাঁর বৌ আর ছেলেমেয়েরা সবাই কাঁদছে।

কুনতী তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন—তাঁরা অমন করে কাঁদছেন কেন।

বামুন বললেন—আমাদের ভীষণ বিপদ! এ বিপদ থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

কুনতীর ভারী কৌতূহল হলো। তিনি বললেন—শুনিই না আপনার বিপদটা কি? তারপর বোঝা যাবে কিছু করা যায় কিনা! বামুন বললেন—সে মা, অনেক কথা। আমাদের গাঁয়ে বক বলে একটা দানব আছে। সে বেটা ভারী পাজী। সে কিছুকাল আগে আমাদের গাঁয়ের যাকেই পেতো, তাকেই ধরে ধরে খেয়ে ফেলতো। সবাই দেখলে, যাকে যেখানে পাবে তাকেই খেয়ে ফেলবে, তা হলে ত বিপদ। তা হলে দু' দিনেই ত গাঁ একদম উজার। ওর সাথে একটা আপোষ যে করেই হোক করা দরকার। তখন সবাই মিলে আমরা বকের কাছে গেলাম। তাকে বললাম—বাবা বক, তুমি যদি যাকে পাও তাকেই খাও—তবে ক' দিনেই ত গাঁয়ের সব লোক শেষ হয়ে যাবে। তারপর কি খাবে? তোমার তখন চলবে কি করে?

বক আমাদের কথাটা ধরলে। সে বললে, তা হলে কি করা যাবে, তোমরাই বল না কেন?

তারপর অনেক কথা কাটাকাটি করে ঠিক হলো

যে তাকে আমরা রোজ সাঁঝের বেলা দুটো করে মোষ, আর ঝুড়ি ভরে লুচি, মনডা, এক মণ চালের পায়েস ও একজন করে মানুষ পাঠিয়ে দেবো। বক ত আমাদের কথা শুনে রেগে উঠলো, বললে—এতটুকু খাবারে আমার চলবে কি করে ?

আমরা তাকে অতি বিনীত ভাবে বললাম—বাবা, তোমার এতে যে খুবই অসুবিধা হবে তা জানি তবু সামনের দিনগুলোর কথা ভেবে আর আমাদের দিকে চেয়ে এ কথাগুলো মেনে নাও।

শেষটায় বক আমাদের কথাতেই রাজী হয়ে গেলো। সেই থেকে নিয়ম হলো যে গাঁয়ের এক এক বাড়ী থেকে রোজ সাঁঝের বেলা বকের খাওয়ার পাঠাতে হবে। আজ আমার পালা। আমার বাড়ীতে ত মানুষ আমরা সবে চার জন। আমি আমার বৌ আর ছেলে মেয়ে। আর সবই ত জোগাড় হয়েছে, এখন মানুষ কাকে পাঠাই, বলুন মা? আমরা ভেবেছি যদি মরতেই হয় তবে সবাই এক সাথে বকের পেটে যাবো। তাই আমরা কাঁদছি।

কুনতী বললেন—ঠাকুর, আপনি ভাববেন না। আপনি অসময়ে আমাদের জায়গা দিয়েছেন। আপনার এ বিপদ থেকে আপনাকে বাঁচানো আমাদের কাজ। আমার ত পাঁচ ছেলে রয়েছে। তাদের একজনকে পাঠালেই ত গোলমাল সব চুকে যায়!

ঠাকুর বললেন—সে কি কথা মা! আপনি ছেলেদের নিয়ে আমার অতিথি। তার ওপর আবার আপনারা বামুন। সে হয় না। তা হলে যে আমার পাপ হবে। পাপ করে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। মরি ত চার জনেই মরবো। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পরের ছেলেকে কেন মরতে পাঠাবো?

কুনতী বললেন—আমিও ত মা। ছেলের দিকে আমারও ত মায়া আছে! ওসব আপনি ভাববেন না কিছু। আমার ছেলেদের আপনি জানেন না। আমার ছেলে ভীমের গায়ে জোর খুব বেশী; তাকে মারবার মত লোক দুনিয়ায় খুব বেশী নেই। ওসব বকটকের কাজ নয়, ওর সাথে এঁটে ওঠা। আপনি যান আর আর সব জিনিসের জোগাড় করুনগে।

কুনতী অনেক বোঝাবার পর বামুন ত শেষটায় রাজী হলেন। তবে তার মনে ভয় যে না রইলো তা নয়!

ভীম ত এ কথা শুনে ভারী খুসী। সে ত লড়াই-ই চায় কি না! ভীম ত শুধু সময় গুণছে কখন বিকেল হবে আর কখন সে বকের বাড়ী যাবে।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেল হয়ে এল। আঁধারও নেমে এল।

মোষের গাড়ীতে লুচি, মনডার ঝুড়ি আর এক মণ চালের পায়েস ওঠানো হলো। ভীম সেই গাড়ী হাঁকিয়ে রওয়ানা হলেন।

কুনতী বামুন ঠাকুরকে হুঁশিয়ার করে বলে দিলেন যে একথা যেন আর কাউকে না বলা হয়।

অনেক দিন ভীম এমন সব ভালো জিনিস খাওয়া ত দূরের কথা, চোখেও দেখেন নি। এমনিই ত ভীম পেটুক মানুষ, তায় আবার এমন সব ভালো ভালো জিনিস! তিনি গাড়ী চালান আর টপাটপ এক একটা করে মনডা মুখে ফেলেন। এই ভাবে

খেতে খেতে ভীম ত বকের বাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন!

পৌঁছেই গাড়ী থেকে সব নামালেন। তখনও ভীমের লোভটা শেষ হয়ে যায় নি। জিনিসগুলো নামিয়েই ভীম আবার খেতে সুরু করলেন।

এদিকে ত বক এসে হাজির। সারাদিন না খাওয়া। বকের পেটে যেন আগুন জ্বলছে। তার খাওয়া ঐভাবে অপরকে খেতে দেখে বক ত রেগেই খুন!

বক ভীমকে ভেবেছিল বামুন বাড়ীর কোন ছেলেটেলে হবে বোধহয়। তাই রাগে সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ওরে বেটা বামুন, তোর এত সাহস যে তুই আমার খাবার খাস! দাঁড়া তোকে মজা দেখাই।

এই বলেই সে একটা গাছের ডাল ভেঙে ভীমকে তাড়া করে এলো। ভীম মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর পেছনে একটা ভীষণ জানোয়ার। কানগুলো তার কুলোর মত দাঁতগুলো তার মূলোর মত। গায়ে বড় বড় লোম।
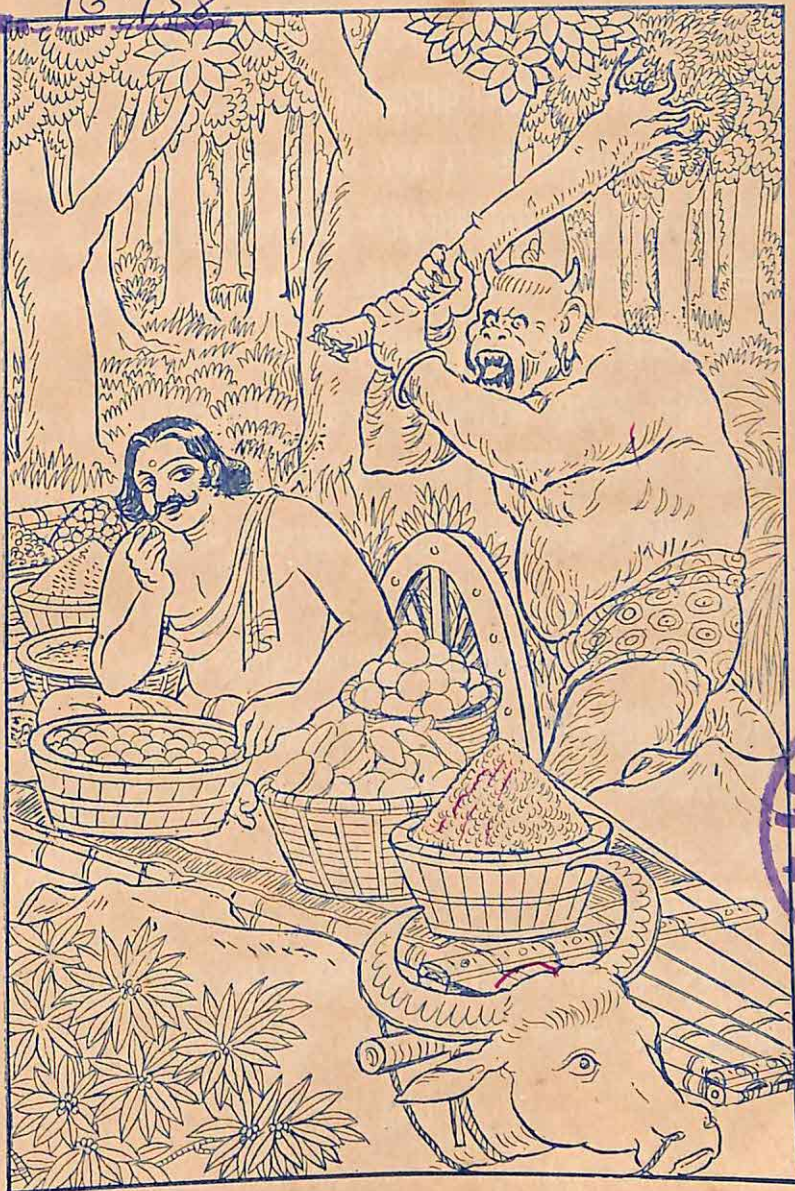
ও রকম একটা জীবকে দেখলে আর যে কেউ হলে ভয়েই হয়ত মরে যেতো। ভীম একটুও পরোয়া না করে খেয়েই যেতে লাগলেন।

এতে বকের রাগ গেলো আরও বেড়ে। বক ওঁর কাছে এসে ওঁর ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—তুই বেড়ে মজা পেয়েছিস ত! আমার খাবার ত তুই-ই খেয়ে শেষ করলি, তা আমি খাবো কি?

ভীম একটু রসিকতা করে বললেন—তুই ত দেখছি ভারী বদ্‌রসিক। বামুন ঠাক্‌রুণ পায়েসটা খুবই ভালো রেঁধেছেন। তাই লোভটা আর সামলাতে পারলাম না।

এসব কথা বলবার সাথে সাথেই পায়েসটা শেষ হয়ে এসেছিল। ভীম কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—আমার খাওয়াটা যে তুই একেবারেই মাটি করে দিলি। দাঁড়া এর ফল তোকে দেখাই।

এই বলেই তিনি ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন। এসেই ওর সাথে লড়াই সুরু করলেন। তারপর

বককে কিল, চড়, ঘুষি আর লাথি যে কত মারলেন তা বলে শেষ করা যায় না। মারতে মারতে বককে তিনি একেবারে মেরেই ফেললেন।

বককে মেরে ভীম রাতের আঁধারে ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে রইলেন। কেউ জানতেও পারলে না যে বককে কে মেরেছে।

পরদিন সকালে সবাই জানলো এক দেবতা এসে রাতের বেলা বককে মেরে গেছেন। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। দেখ, পানডবদের মা কুনতী কত ভালো মানুষ ছিলেন। পরের ছেলেকে বাঁচাতে, বিপদ জেনেও তিনি দানবের মুখে নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলেন।

এ ঘটনার পর সেখান থেকে পানডবেরা সরে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এলেন এক রাজার দেশে। এ দেশের নাম পানচাল। পানচাল দেশের রাজার মেয়ের নাম পানচালী। ভারী রূপসী মেয়ে। তখন রাজার মেয়ের বিয়ের কথা চলছিল। তবে রাজার একটা পণ ছিল। যে সেই পণ জিতবে তার সাথেই পানচালীর বিয়ে দেওয়া হবে।

পণও ত যেমন তেমন পণ নয়। খুব উঁচুতে একটা মাছ ঝোলানো থাকবে। সেই মাছের নীচে থাকবে একটা চাকা। সেই চাকাটা সব সময়েই ঘুরতে থাকবে। তারই নীচে মাটিতে এক জায়গায় থাকবে জল। সেই জলে মাছের ছায়া দেখে তীর ছুড়ে মাছের চোখটাকে বিঁধতে হবে। কি কঠিন কাজ একবার ভেবে দেখতো।

দেশে দেশে খবর পাঠানো হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে কত রাজার ছেলে এলো আর গেলো, কেউ পারলো না তীর ছুড়ে মাছের চোখ বিঁধতে। কৌরবেরাও এসেছিল। একের পর এক করে তারা এক শ' ভাই তীর ছুড়লে—পারলে না তারা মাছের চোখ বিঁধতে।

খবর পেয়ে পানডবেরা পাঁচ ভাইও সেখানে এলেন। তাঁদের মুখ ভরা দাড়িগোফ, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ওঁদের দেখে সবাই বললে—কত সব ঝানু ঝানু লোক এ কাজ করতে পারলো না আর ওরা পারবে এ কাজ!
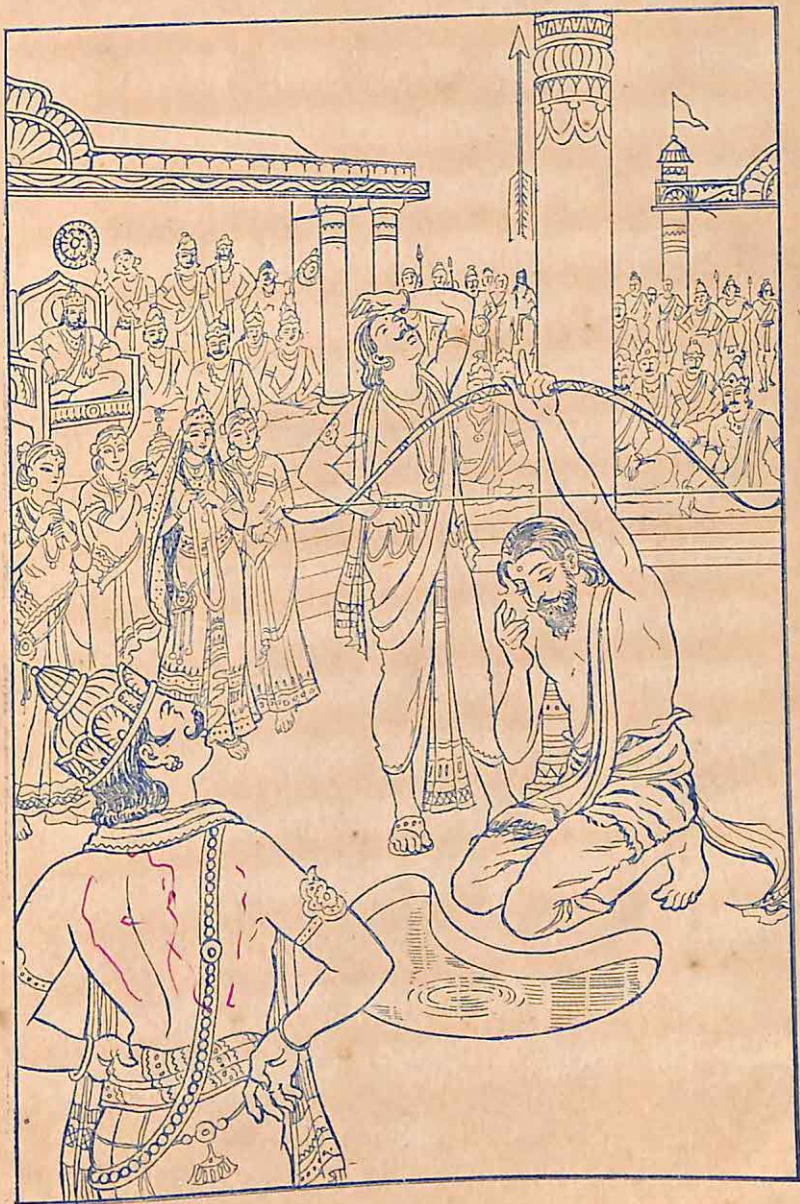
এসব কথা পানডবেরা আমলেই আনলেন না। তাঁরা তাঁদের কাজ করতে তৈরী হলেন। তখন সবাই কত হাসি-তামাসা, কত গালাগাল ওদের দিতে লাগলো। এতেও তাঁরা পিছু-পা হলেন না।

অরজুন ছিলেন তীর ছোড়ায় ওঁদের ভেতর সব চেয়ে পাকা। তিনি তৈরী হয়ে এগিয়ে গেলেন। তীর ছুড়লেন। তীর একেবারে সরাসরি মাছের চোখে গিয়ে বিঁধলো।

ফলে হলো আর এক বিপদ। সভায় যে সব রাজার ছেলেরা হাজির ছিল তারা বলতে লাগলো— কত সব রাজার ছেলে এলো আর গেলো তারা কেউ পারলে না এ কাজ আর পারলে কি না কতগুলো ভিখিরী! সবাই এতে ভারী অপমান বোধ করলে। তারা এ অপমানের শোধ নেবে ঠিক করলে। তারা তলোয়ার, তীর-ধনু নিয়ে ওদের সাথে লড়াই করতে গেলো।

ওরা পাঁচ ভাইও ত কম ন'ন। তাঁরা কেন এতে ভয় পাবেন? তাঁরাও তীর-ধনু নিয়ে রুখে

দাঁড়ালেন। শেষটায় লড়াই করে সবাইকে হারিয়েও দিলেন।

তখন সবার কৌতূহল হলো এরা কে তাই জানতে। সবাই ভাবলে এরাও হয় ত কোন রাজার ছেলেটেলে হবে, গোপনে এখানে এসেছে। রাজার ছেলে না হলে এমন বীর হয়!

তাঁদের পরিচয় একটু পরেই পাওয়া গেল। তখনই সবাই জানলে যে পানডবেরা গালার ঘরে পুড়ে মরেন নি। পানচালীর বিয়ে হয়ে গেলো পানডবদের সাথে। পানচালীকে নিয়ে ওঁরা ফিরলেন দেশে।

জেঠামশাই দেখলেন ভারী বিপদ। তিনি দেশটাকে সমান ভাগ করে পানডব আর কৌরবদের দিলেন। এতেও গোলমালের শেষ হলো না। এখনও সবাই পানডবদের ভাল বলতো আর কৌরবদের গালাগাল দিত। তা লোকের মুখ আর কি করে চেপে রাখা যাবে? খারাপকে খারাপই বলবে সবাই, ভালো বলবে না কেউ। এতে কৌরবেরা আবার

নতুন করে পানডবদের হিংসা করতে লাগলো। কি করে ওঁদের নাকাল করা যায়, আবার নতুন করে তাই ভাবতে সুরু করলে।

—তিন—

আবার সেই সব বদ সাথীগুলো তাদের সব বদ রকমের কথা বলতে সুরু করলে। কি ভাবে তাদের অপমান করা যায় সে সব কথাও তারা অনেক কিছুই ওদের বললে।

পানডবেরা খুব বড় রকমের একটা হোম করলেন। দেশ-বিদেশের সব রাজা এলেন এই হোম দেখতে। সবাই বলে গেলেন—আপনারাই এখন দেশের সব চেয়ে ভালো ও বড় রাজা। আমরা সকলেই আপনাদের কথা শুনে চলবো।

এসব শুনে কৌরবদের হিংসা আরও বেড়ে গেলো।

কৌরবদের সেই পাজী মামা শকুনি ওদের বললো —ওদের তোমরা তোমাদের সাথে পণ রেখে পাশা

খেলতে বলো। তারপর যা করবার তা আমি করবো।

সে যুগে রাজরাজড়াদের ভেতর নিয়ম ছিল যে, এক রাজা যদি আর এক রাজাকে পাশা খেলতে বলতেন, তবে তাঁকে সে অনুরোধ রাখতেই হতো। নইলে তা অপমান বলে ধরে নেওয়া হতো। পাশা খেলা হতো পণ রেখে। যে জিততো সেই বাজির পণ পেতো।

সে যুগে পাশা খেলায় শকুনির ভারী নাম ছিল। তার এক জোড়া যাদুর পাশা ছিল। তাতে যে দান খুসী তাই ফেলা যেতো। তাই শকুনিকে এ খেলায় কেউ-ই হারাতে পারতো না।

পানডবেরা কৌরবদের সাথে পাশা খেলতে রাজী হলেন। আর রাজী না হয়েই বা উপায় কি? নইলে যে তাঁদেরই অপমান।

কৌরবদের দিকে বড় খেলোয়ার হলো শকুনি। খেলা সুরু হয়ে গেলো। যাদুর পাশায় যখন যে 'দান' খুসী তা-ই পড়ে। আর পানডবেরা হেরে যান।

শকুনি কতকটা সময় খেলেই পানডবদের হারিয়ে দিলে।

এইভাবে কয়েকবার কয়েক রকম পণ রেখে খেলা হলো। সব কয়েক বারই পানডবেরা হেরে গেলেন। এর পর খেলা সুরু হলো পানচালীকে পণ রেখে। সে খেলায়ও পানডবেরা হেরে গেলেন।

তখন কৌরবেরা পানচালীকে সভার মাঝে টেনে নিয়ে এসে ভারী অপমান করলেন। পানচালীর গা থেকে ওরা কাপড় গয়না সব কেড়ে নিতে চাইলেন। এ অপমানের হাত থেকে বাঁচতে পানচালী ভগবানকে মনে মনে ডাকতে লাগলেন। ভগবানের দয়ায় তিনি অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

যাক এরপর পণ রাখা হলো যে, যে এবার হারবে তাকে তেরো বছর বনে গিয়ে থাকতে হবে। আবার এর শেষ বছরটি এমন ভাবে থাকতে হবে যে কেউ যেন না জানতে পারে তারা কে। এবারও পানডবেরা হেরে গেলেন।

—চার—

পাঁচ ভাই খেলায় হেরে বনে চললেন বাজির পণ রাখতে। সাথে চললেন পানচালী।

যাবার সময় কৌরবেরা পানডবদের যা খুসী তাই বলে গালাগাল দিতে লাগলো। ভীম খুব রাগী ছিলেন। এসব শুনে ত তিনি রীতিমত রেগে গেলেন। তিনি রেগে গিয়ে ওদের বললেন—এরপর ফিরে এসে যখন তোদের সাথে লড়াই করবো তখনই এসব কথার ঠিক ঠিক জবাব তোরা পাবি। আমি একাই তোদের একশ' ভাইকে মারবো। বীর বলে তোদের যে সাথীর গৌরব তোরা করিস তাকে ভাই অরজুন মারবে। আর সহদেব ঐ শয়তান শকুনিটাকে মারবে।

পাঁচ ভাই বনে চললেন পানচালীকে নিয়ে আর কুনতী রইলেন বিদুরের কাছে।

পানডবেরা বনবাসে যাবেন শুনে অনেক লোক

ঠিক করে ফেললে যে, তারা আর ঐ শয়তানের দেশে থাকবে না। তারা সে দেশ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবে। বনবাসে যাবার আগে অনেকেই পানডবদের সাথে দেখা করতে এলেন। সবার মনেই খুব দুঃখ। দুঃখ হলেই বা তারা আর এর কি করতে পারে! কেউ কেউ তাঁদের বললে—তোমরা যেও না। পাশা খেলায় হেরেছ ত কি হয়েছে? ও রকম অনেক কিছুই দুনিয়ায় হয়। অত সাধু হলে চলে না। তোমরা ওদের সাথে লড়াই কর।

যুধিষঠির বললেন—না, সে হয় না। আমি বাজির পণ হেরেছি। আমাকে কথা রাখতেই হবে। নইলে যে আমাকে নরকে যেতে হবে।

পানডবেরা বনে যাবার পরও কৌরবেরা ওঁদের পেছনে লাগা ছাড়লো না। ওরা ভাবলে, তেরো বছর পরেই ত এই দুষমণগুলো ফিরে আসবে, ওদের অংশ ওরা ফিরে চাইবে!

তবে এখন কি করা যায়! না, ওঁদের আরো ভালো করে নাকাল করা দরকার।

সে সময় এক ঋষি ছিলেন। তাঁর নাম দুরবাশা। তিনি ছিলেন ভারী রাগী। তিনি একবার কারো ওপর রেগে গেলে তার আর বাঁচোয়া ছিল না। তিনি তাকে অভিশাপ না দিয়ে ছাড়বেন না। তাই তাঁকে সবাই খুব ভয় করতো। এই ঋষিঠাকুর একবার দুরযোধনের দরবারে এলেন। তাঁর সাথে আরও দশ হাজার ঋষি ছিলেন। দুরবাশা আর তাঁর সাথের ঋষিদের দুরযোধন খুব ভালো করে সেবা করল। সেবায় ঋষিঠাকুর খুব খুসী হলেন। বললেন-- তোমায় আমি বর দেবো। বল, তুমি কি বর চাও।

দুরযোধন বললে—আপনার কাছে আমার আর চাইবার মত কি বর আছে? লোকে বলে যে পানডবেরা খুব সাধু। সেই কথাটাই একবার আপনি যাচাই করে দেখুন—এই বরই আমি চাই। এই দশ হাজার ঋষিকে নিয়ে আপনি ওদের কাছে যান। ওরা যদি আপনাদের সেবা করে খুসী করতে পারে তবেই বুঝবো যে ওরা সাধু।

দুরবাশা বললেন—বেশ তাই হবে।

এই বলেই ঋষি তাঁর সাথীদের নিয়ে চলে গেলেন।

দুরযোধনের মন খুসীতে ভরে উঠলো। সে ভাবলে এবার পানডবেরা বুঝবে মজা। বনের ভেতর কোথা থেকে ওরা দশ হাজার ঋষির খাবার যোগাড় করবে। আর কি সেবাই বা ওরা সেখানে ঋষিদের করতে পারবে! তারপর দুরবাশা ঋষি যে রাগী মানুষ, যদি সেবাটেবা ভালোমত না হয় তা হলে অমনি অভিশাপ। আর তার ফল ত জানাই আছে।

পানডবেরা যে বনে ছিলেন দুরবাশা ঋষিদের নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তা-ও কখন জানো—সেই দুপুর রাতে

তখন সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল আর খাওয়া না হলেই বা কি ? একে বনের ভেতর, তা-ও আবার ঐ অসময়ে! কোথা থেকে তাঁরা তখন এতগুলো লোকের খাওয়ার যোগাড় করবেন।

পানচালী তখন মনে মনে ভগবানকে ডাকতে

লাগলেন। বললেন—হে ভগবান তুমি অনেক বিপদ, অনেক অপমান থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ, এবারও বাঁচাও।

যাঁরা সাধু, সৎ, কখনও খারাপ কাজ করেন না, তাঁরা বিপদে পড়ে যদি ভগবানকে ডাকেন তবে তিনি তাঁদের সহায় হ'ন।

ভগবান এবারও ওদের এ বিপদ থেকে বাঁচালেন।

ঋষিরা সেখানে খেতে চাইলেন না। তাঁরা বললেন যে, তাঁদের তখন আর খাওয়ার দরকার নেই। তাঁরা খাবেন না কিছুই।

দেখলে কি মজা! ভগবানের দয়ায় কি না হয়!

এবারেও কৌরবেরা সফল না হয়ে আরও রেগে গেলো। ওরা ঠিক করলে, যে করেই হোক না কেন খুব ভালো করেই ওরা ওদের নাকাল না করে ছাড়বে না। ওরা ঠিক করলে যে, পানচালীকে চুরি করে আনবে। পানচালীকে ত পানডবেরা খুব ভালোবাসেন। ওরা ভেবেছিল তাঁকে চুরি করে আনলে তাঁর শোকেই পানডবেরা মারা যাবে।

দুরযোধনের এক বোনের জামাই ছিল। সে লোকটা বড় ভালো ছিল না। তাকেই কৌরবেরা পানচালীকে চুরি করে আনতে পাঠালে। সে লোকটা ত গিয়ে হাজির বনের ভেতর সেই পানডবদের কুটীরে। তখন পানচালী ছাড়া কুটীরে আর কেউ ছিলেন না। সে চুপি চুপি কুটীরে ঢুকে জোর করে টেনে রথে তুলতে গেলো পানচালীকে। তিনি চেঁচামেচি করতে সুরু করে দিলেন।

তাঁর কাঁদবার আওয়াজ পেয়ে পাঁচ ভাই ছুটে এলেন। তারপর যা হলো সে আর কি বলবো। ভীম, অরজুন, নকুল, সহদেব মিলে এমন মারই তাকে মারতে সুরু করলে যে, সে মরে যায় আর কি!

তখন য়ুধিষঠির এলেন ছুটে। তিনি বললেন—আরে তোরা ওকে আর মারিস নে। ও মরে যাবে যে! আমাদের বোন যে তা হলে বিধবা হবে, আর জেঠা মশাই বুড়ো মানুষ—তার ওপর তিনি আবার চোখে দেখেন না, ওর শোকে তিনিও যে তা হলে মরে যাবেন।

যুধিষ্ঠিরের কথায় ওরা তাকে ছেড়ে দিলে। সে পালিয়ে বাঁচলো। এ ভাবেই কৌরবদের সব কৌশল বানচাল হয়ে যেতে লাগলো। তারা আর কিছুতেই পানডবদের নাকাল করতে পারে না।

যাঁরা সৎ ও সাধু ভগবান সব সময় তাঁদের সহায় হন। তাঁদের কোন খারাপই কেউ করতে পারে না।

এর পর হলো আর এক ঘটনা।

একদিন পাঁচ ভাই পানচালীকে নিয়ে কুটীরে বসে আছেন এমন সময় তাঁদের ভারী পিপাসা পেলো। কুটীরে জল একটুও নেই। যুধিষঠির পুকুর থেকে জল আনতে বললেন সহদেবকে। অনেক সময় কেটে গেলো তবু সে জল নিয়ে ফিরে এলো না। ওরা ত কুটীরে বসে ভেবে ভেবে সারা। আবার পাঠানো হলো নকুলকে। তিনিও ফিরলেন না।

এমনি করে অরজুন, ভীম, পানচালী—একে একে সবাই গেলেন। কেউই আর ফিরে এলেন না। তখন যুধিষঠির নিজেই গেলেন ওদের কি হলো দেখতে।

তিনি গিয়ে দেখেন পুকুরের জলে সবাই ভাসছেন। সবাই মরে গেছেন। এই না দেখে তাঁর মনেও ভারী দুঃখ হলো। তিনি ভাবলেন, এভাবে সবাইকে হারিয়ে তাঁর একা বেঁচে থেকে লাভ কি? তিনিও জলে ডুবে মরতে গেলেন।

পুকুরের পারে এক বক বসেছিল—সে মানুষের মত স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললে—তুমি জলে ডুবে মরো না। আমার কথার জবাব আগে দাও, তারপর যা করতে হয় করো। আমিই তোমার ভাইদের মেরেছি।

যুধিষ্ঠির ত বকের কথা শুনে অবাক। তিনি বককে বললেন—কি কথা তোমার বল।

বক বললে—আমার চারটি কথার জবাব তোমায় দিতে হবে। পয়লা কথা হলো গিয়ে—দুনিয়ার সব চেয়ে বড় খবর কি? দুই হলো—সব চেয়ে আজব কি? তিন হলো—পথ কি? আর চার—সব চেয়ে সুখী কে?

যুধিষ্ঠির সাথে সাথেই একথাগুলোর জবাব

দিলেন। তিনি বললেন—পয়লা কথার জবাব হলো যে, বয়স হলেই মানুষ মরে। দুয়ের হলো, মরাটাই নিয়ম তবু সকলেই ভাবে, সে কখনও মরবে না। তিনের হলো, সাধু লোকেরা যে পথে চলেন সেটাই পথ। আর চারের জবাব হলো, যে কারো কাছে দেনা নেই, যে অপর কারো বাড়ীতে থাকে না—নিজের বাড়ীতে থাকে সেই সব চেয়ে সুখী।

বক তার জবাবগুলো শুনে ভারী খুসী হলো। বললো, তোমার জবাব শুনে আমি যে কত খুসী হয়েছি তা আর বলবার নয়। তুমি গিয়ে পুকুরের জল পান কর।

যুধিষ্ঠির বললেন—আমার ভাই আর বোকে হারিয়ে আমার আর বাঁচবার সাধ নেই।

বক বললো—দেখো, তুমি ওদের ভেতর থেকে যাকে খুসী একজনকে বাঁচিয়ে নিতে পার।

যুধিষ্ঠির বললেন—একজনকে যদি বাঁচাতে হয় তবে সহদেবকেই আমি বাঁচাতে চাই।

বক বললো—তোমার ভাই ভীম, অরজুন কত

বড় বীর, তোমার কত বড় একটা বল! তাদের ছেড়ে তুমি সহদেবকে বাঁচাতে চাইছো কেন?

যুধিষ্ঠির বললেন—এর আর কোন কারণ নেই। এর কারণ, সহদেব হলো আমার ছোট মার ছেলে আর সে তার মার ছোট ছেলে, আমি তাই তাকেই বাঁচাতে চাই। ও মরলে আমার ছোট মার মনে ভারী দুঃখ হবে। আমার মায়ের ত আমি রইলামই।

বক তখন বললো—তোমার কথা আমি যা শুনেছিলাম তুমি তা-ই। তুমি একেবারে খাটী সাধু। আমি কে তা হয় ত তুমি বোঝ নি। আমি বকবেশী দেবতা। তোমায় আমি পরখ করে দেখলাম। আমিই তোমার ভাইদের মেরেছিলাম। ঐ দেখ ওরা সব আসছে।

যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন তাঁর ভাইয়েরা আর বৌ পানচালী তাঁর দিকেই আসছেন। তখন সেখানে একটা খুসীর সোরগোল পড়ে গেলো।

বকের দিকে তাকাতে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখেন বক

নেই। কখন কোথায় মিলিয়ে গেছেন তা-ও বোঝা গেলো না।

বারো বছর ত তাঁদের এভাবে কাটলো এক রকম। এখন ত সেই শেষ বছরের গোপনে থাকবার পালা। এখন থেকে তাঁদের পূরোপূরি গা ঢাকা দিয়েই চলতে হবে।

তাঁরা মনে মনে ভেবে ঠিক করলেন যে তাঁরা নাম ভাড়িয়ে, সাজ পোষাক সব বদলে, কোথাও কারও বাড়ীতে চাকুরী নিয়ে এই সময়টা কাটিয়ে দেবেন।

—পাঁচ—

আজকাল জয়পুর বলে একটা দেশ আছে। ঐ দেশের আগে আর একটা নাম ছিল। সে দেশের রাজার নাম ছিল বিরাট। ওঁরা সবাই গিয়ে সেই বিরাট রাজার বাড়ীতে চাকুরী নিলেন। সেখানে যুধিষঠির হলেন—রাজার সভাসদ, আর ভীম করতেন পাকঘরের কাজের তদারক আর অরজুন

মেয়ের বেশ পরে রাজবাড়ীর মেয়েদের নাচ শেখাতেন। নকুল রাজবাড়ীর ঘোড়া চরাতেন আর সহদেব চরাতেন গরু। পানচালী হলেন রাণীর সহচরী।

বিরাট রাজা নিজে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তা হলে কি হবে? ওঁর এক শালা ছিল—সে লোকটা ছিল ভারী পাজী। তার নাম কীচক। এমনি পানডবদের সেখানে বেশ ভালোই কাটছিল। তবে মাঝে মাঝে কীচকটা ভারী গোলমাল করতো। একদিন ত কীচক পানচালীকে অপমানই করে বসলো। পানচালী গিয়ে সে কথা ভীমকে জানালেন।

ভীম ত শুনে রেগে আগুন। তিনি বললেন—ও লোকটা ভাবে ওর গায়ে যখন জোর খুবই বেশী তখন আর ওকে পায় কে! ও যা খুসী তা-ই করে বেড়াবে আর সবাই তা মেনে নেবে। বেশ, তোমায় অপমান করবার মজাটা আমি ওকে শীগগীরই বুঝিয়ে দেবো।

একদিন রাতের বেলা ভীম কীচককে বাগে পেয়ে

এমন মার দিলেন যে, বাছার আর উঠে দাঁড়াতে হলো না। বেচারা মরেই গেলো শেষটায়।

কীচক মরায় বিরাট রাজা মনে খুবই দুঃখ পেলেন। কারণ ওর ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেতো না। তবে তিনি জানতে পারলেন না কে তাকে মেরেছে। জানতে পারলে, পানডবদের খুবই মুশকিল হতো।

এদিকে কৌরবেরা একশ' ভাই ত পানডবদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। অনেক খুঁজেও তাঁদের খোঁজ তারা পেলো না। যদি একবার ওরা পানডবদের খোঁজ পেতো তা হলে পানডবদের ভারী অসুবিধাই হতো। আবার নতুন করে সেই তেরো বছরের বনবাস হতো।

বিরাট রাজার অনেক গরু ছিল। অনেক বলতে মনে করো না যে দু'এক হাজার—কয়েক লাখ। এ গরুগুলোর ওপর অনেকেরই বেশ একটা লোভ ছিল। তবে এতদিন কীচকের ভয়ে কেউ কিছু করতে সাহস পায় নি। কীচক মরেছে শুনতে পেয়ে অনেকেই এ

গরুগুলো লুঠ করে নিতে এলো। এক রাজা এলো এই গরুগুলো লুঠ করবে বলে। তবে ভীমের কৌশলে কিছুই করতে পারলো না। বিফল হয়ে চলে গেলো।

এরপর কৌরবেরাও এসেছিল একবার ঐ গরুগুলো চুরি করতে। অরজুন এমন একটা কায়দা করে দিলেন যে তারাও কিছু করতে পারলে না। তার চেহারাটা তখন পূরোপূরি বদলে গিয়েছিল কি না। তাই আর তাঁকে ওরা চিনতে পারে নি।

এই ভাবেই দিন কাটছিল ওঁদের বিরাট রাজার বাড়ীতে।

এদিকে ধীরে ধীরে ওঁদের গোপনে থাকবার বছরটাও শেষ হয়ে গেলো। তখন সবাই তাঁদের পরিচয় জানতে পারলে।

পরিচয় পেয়ে রাজা বিরাট যে কত খুসী হলেন তা আর কি বলবো। রাজা বিরাট তাঁর মেয়েকেই বিয়ে দিয়ে দিলেন শেষটায় অরজুনের ছেলের সাথে। ছেলেটির নাম অভিমন্যু। এ-ও তার বাবার মতই বীর ছিল।

এরপর বিরাট রাজার বাড়ীতে এক সভা বসলো। এতে অনেকেই যোগ দিলেন। এই সভায় ঠিক হলো যে হস্তিনাপুরে খবর পাঠানো হবে যাতে সহজে পানডবেরা তাঁদের অংশটা কৌরবদের হাত থেকে পায়। তাঁরা ত এতদিন দুঃখই পেয়েছেন। আর যাতে তাঁদের না ভুগতে হয়। এসব কথাই দূতকে দিয়ে সেই কাণা রাজাকে বলে পাঠানো হলো।

দূত গিয়ে সব খবর রাজাকে বললে। পানডবেরা বেঁচে আছে শুনে রাজা যে কত খুসী হলেন তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি পানডবদের খুঁটিনাটি অনেক কথাই দূতের কাছে জানতে চাইলেন। ওরা কেমন আছে। বৌমা কেমন আছেন—এই রকম অনেক কথা। ওদের খুবই ভালোবাসতেন ত তিনি!

রাজা তখন তার সেই একশ' ছেলেকে ডেকে বললেন, দেখো হে বাপু, এবার ত তেরো বছর শেষ হয়ে গেলো, এখন ত পানডবেরা ফিরে আসবে।

ওদের অংশটা এখন ত ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে তোমাদের।

ছেলেগুলো সব ঘাড় নেড়ে বাপকে বললে—না, না, তা কখনোই আমরা দেবো না। তুমি যতই বল না কেন?

রাজা ওদের অনেক বোঝালেন। শেষটায় অনেক অনুরোধও করলেন! তবু কিছু ফল হলো না। তারা বললে যে, লড়াই না করে সূঁচ রাখবার মত জমিটুকুও আমরা ওদের ছেড়ে দেবো না। সাহস থাকে ত ওরা আসুক আমাদের সাথে লড়াই করতে। দেখবো কত বড় বীর ওরা।

কৌরবদের মুখে একথা শুনে রাজা আর কি করেন! তিনি শুধু ওদের এইটুকুই বললেন—তোরা জেনে রাখিস এর ফল একেবারেই ভালো হবে না।

এর পর দূতের মুখে রাজা খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, কৌরবেরা তার কথা শুনতে চায় না। তারা বলছে যে লড়াই ছাড়া তারা পানডবদের অংশ ছেড়ে

দেবে না। পানডবেরা যা খুসী তা-ই করতে পারে। আমার আর এখন বলবার কিছু নেই।

এ খবর শুনে সবাই কৌরবদের ওপর রেগে গেলো। তারা সবাই বলতে লাগলো—বেশ ভালো কথা। কৌরবেরা লড়াই চায়, লড়াই-ই হবে, আপোষ চায় আপোষ-ই হবে।

শেষটায় লড়াই-ই হলো। সবাই কৌরবদের অনেক বোঝালে। কিছুই ফল হলো না।

ওদের দেশের কাছে ছিল বিরাট এক মাঠ। সেই মাঠেই লড়াই হবে ঠিক হলো।

দেশের ছোট বড় সব রাজাই এই লড়াইতে এসে যোগ দিলেন। যার যে দলে খুসী ভিড়ে পড়লেন।

দেশে তখন একজন ভারী সাধু রাজা ছিলেন। তিনি খুব চতুরও ছিলেন। সকলেই বলতো ইনি শুধু একটা দেশের রাজাই নন ইনি ভগবানের অবতারও। ইনি মানুষ হয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, মানুষের ভালো করতে। নারায়ণও বলতো এঁকে সবাই।

কৌরব ও পানডব দু' দলই তাঁর আপনার লোক।

তিনিও দু'দলে আপোষ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও কোন ফল হয় নি। এঁর বেশ বড় একটা সেনাদল ছিল। এই সেনাদলকে বলতো নারায়ণী সেনা। এরাও নানা রকম লড়াইতে খুব পাকা ছিল।

দু' দলই নারায়ণকে তাদের দলে টানতে চাইলো। তিনি বললেন—দেখো, আমি একা দু'দলে যাই কি করে? তোমাদের কারো কথাই আমি ফেলতে পারিনে। তবে তোমরা এক কাজ করতে পারো, আমি এক দিকে আর আমার সেনাদল একদিকে। এর ভেতর তোমাদের যে যা খুসী তা-ই বেছে নাও।

কৌরবেরা একথা শুনে ত লাফিয়ে উঠলো। তারা বললো—আমরা নারায়ণকে চাই না, নারায়ণী সেনাই চাই।

পানডবেরা কৌরবদের কথা শুনে খুসীই হলেন তাঁরা বললেন আমরা আর কিছুই চাই নে। আমরা নারায়ণকেই আমাদের দলে পেতে চাই। তাঁকে পেলে আমাদের আর কিছুই দরকার হবে না।

—ছয়—

লড়াই সুরু হয়ে গেলো। পানডবদের দলে লড়াইতে সব চেয়ে পাকা অরজুন। তিনিই তাঁদের সেনাদলকে চালাবার ভার নিলেন। নারায়ণ নিজে তাঁর সারথি হলেন। তিনি ওঁর রথ চালাতে লাগলেন।

লড়াইয়ের মাঠে লাখ লাখ লোক। ভারী কৌশলে নারায়ণ রথ চালিয়ে যেতে সুরু করলেন। রথ থেকে ঘন ঘন তীর ছুড়ে অরজুন কৌরবদের সেনাকে মারতে লাগলেন। অরজুন এক একটা তীর ছোড়েন আর কৌরবদের দলে হাহাকার পড়ে যায়।

কৌরবদলের সেনাপতি ছিলেন তাদের উভয় দলের এক ঠাকুর দা'। বুড়ো মানুষ। তা হলেও খুব বড় বীর। তাঁর মত বীর দেশে তখন খুব বেশী ছিল না। দেবতার বরে তিনি ছিলেন অমর। তবে খুসী

হলে তিনি মরতেও পারবেন—এই ছিল বরটি। লড়াই করতে করতে শেষটায় তিনিও কাবু হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরে এত বাণ বিঁধেছিল যে, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ঐ বাণগুলোর ওপরেই তিনি শুয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরটা মাটিতে লাগলো না। এ দুঃখ থেকে মরা ভালো। তাই তিনি একটা শুভ সময় দেখে মরে গেলেন।

এর পর সেনাপতি হয়ে এলেন পানডব ও কৌরবদের যিনি তীর ছোড়া শেখাতেন সেই গুরুদেব। তিনি মহাবীর ছিলেন। তিনি লড়াইয়ের অনেক নতুন নতুন কায়দা জানতেন। সেইভাবে তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অরজুন একদিকে লড়াই করছিলেন। সেদিক ছেড়ে আসেন কি করে! এখন এই বীরের সাথে লড়াই করবে কে? এই হলো পানডবদের ভাবনা। তখন অরজুনের ছেলে অভিমনু ওঁর সাথে লড়াই করতে এলো। এই মহাবীরের সাথে অতটুকু ছেলেকে লড়াই করতে আসতে দেখে কৌরবদের দলে

ত একেবারে হাসির রোল পড়ে গেল। কিছুকাল পরেই কৌরবদের ভুল ভেঙে গেলো।

তারা যা ভেবেছিল তা নয়! এ ছেলেও বাপের মতই। তার লড়াই করবার কায়দা দেখে সবাই ত অবাক। গুরুদেব দু' দুবার ওর কাছে হেরে গেলেন। কৌরবেরা এসে গুরুদেবকে গালাগাল দিলে। আপনি না খুব বড় বীর। তবে এতটুকু ছেলের সাথে পারছেন না কেন? আর আর সেনাপতিদেরও তারা বললে—যে করেই হোক ওকে হারাতেই হবে। তোমরা সব এত বড় বড় বীর ওর কাছে নাকাল হবে!

এ কথার পরে ওরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে উঠলো। তারা সুযোগ খুঁজতে সুরু করলে ছেলেটাকে কি করে কাবু করবে। একবার সুযোগ পেয়েও গেলো। তখন সাত সাতটা বড় বীর গিয়ে ওই ছেলেটাকে ঘিরে ধরলে। ওর হাতের ধনুকের গুণটা তারা তীর ছুড়ে কেটে দিলে। রথটাকে ভেঙে চুরমার করে দিলে। আর ওর শরীরে তারা তীর ছুড়তে লাগলো।

এতেও ছেলেটি ভয় পেলো না। সে খালি হাতে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের সাথে যুঝতে লাগলো। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সরদার—এ করে ত আর লড়াই চলে না। সে মাঠ থেকে কাঠ পাথর তুলে কৌরবদলের লোকদের দিকে ছুড়তে লাগলো। তা-ও যখন শেষ হয়ে গেলো তখন রথের একটা চাকা খুলে নিয়ে ওদের তাড়া করে গেলো।

এভাবে কি আর লড়াই করা চলে! কিছু সময় পরেই সে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন যা হলো তা আর বলা যায় না, তখন কৌরবদের সেনাপতিরা তীর মেরে মেরে ঐটুকু ছেলেকে মেরে ফেললে। অতটুকু ছেলে বলে তাকে ওরা রেহাই দিলে না।

গুরুদেবও শেষটায় রেহাই পেলেন না। তিনিও পানডবদের হাতে মারা গেলেন। এরপর আর এক বীর কৌরবদের সেনাপতি হলেন। তাঁরও বেশী সময় কাটলো না। তিনিও মারা গেলেন। অভিকে যারা মেরেছিল এই বীরটিও তাদের দলে ছিলেন।

—সাত—

এ সব ঘটনায় অরজুন ভারী মুষড়ে পড়লেন; তিনি তাঁর সারথি নারায়ণকে বললেন—সখা, এ সব দেখে আমার আর লড়াই করতে ভালো লাগে না। আমায় মাপ করুন, আমি আর লড়াই করবো না।

অরজুন নারায়ণকে সখা বলেই ডাকতেন কি না।

নারায়ণ বললেন—সখা, ভয় পেও না। পাপী যারা তাদের না মারলেই পাপ হয়। তুমি আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ সুরু কর। আমি এমন একটা দেশ তৈরী করতে চাই, যে দেশে কোন পাপী থাকবে না। তা করতে তোমার সহায়তা আমার দরকার।

এ কথায়ও অরজুন কোন উৎসাহ পেলেন না। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন নারায়ণ বললেন—তুমি যদি এ কাজ না কর তা হলে আমাকেই এ কাজ করতে হবে।

পাপীদের আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবোই আর বাঁচাবো সাধুদের।

অরজুন বললেন—ওরা সবাই ত আর পাপী নয়।

নারায়ণ বললেন—হা, সে কথা ঠিক। কৌরবেরা পাপী। যারা ওই পাপীদের দলে ভিড়েছে, তাদের কাজে সায় দিয়ে চলেছে, তাদের কি বলতে চাও? তারা কি পাপী নয়?

এসব কথায়ও কোন ফল হলো না। অরজুন শুধু চুপ করে তাঁর কথা শুনেই গেলেন। কোন জবাবই তিনি দিলেন না।

তখন নারায়ণ বললেন—দেখ অরজুন তুমি আমাকে তোমার সখা বলেই জান। আমি যে কে তা হয় ত তুমি জানো না। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।

অরজুন মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পেলেন তাতে আর তাঁর মুখ থেকে কথা সরলো না। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন

সারা ছুনিয়াটা এসে যেন নারায়ণের ভেতর জড়ো হয়েছে। শরীরে যেন তাঁর আগুন জ্বলছে।

অরজুন হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

নারায়ণ মুচকি হেসে বললেন—যাও আর ভুল করো না।

অরজুন নারায়ণের পায়ে পড়ে মাপ চাইলেন। বললেন—আমার মত সুখী ছুনিয়ায় আজ আর কেউ নেই। আমি ভগবানের দেখা পেয়েছি। ভগবান নিজে আমার রথের সারথি হয়েছেন।

—আট—

এরপর নতুন উৎসাহ নিয়ে লড়াই সুরু করলেন অরজুন। ভীম গদা নিয়ে যে লড়াই করলেন তা আর কি বলবো। যুধিষঠির, নকুল, সহদেবও কি কম! তাঁরাও খুব জোর লড়াই চালালেন।

দলে দলে লোক মরতে লাগলো। এখন লড়াইয়ের মাঠে শোনা যায় শুধু কাঁদবার আওয়াজ আর চীৎকার।

দুঃশাসনকে ভীম নখ দিয়ে ছিড়ে ফেললেন। দুরযোধনের সাথেও গদা নিয়ে ভীমের খুব লড়াই হলো। নারায়ণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবে দুরযোধনকে মারতে হবে তা ভীমকে বলে দিলেন। ভীম গদার এক ঘায়ে দুরযোধনের উরু ভেঙে দিলেন। শয়তান শকুনিটাকে মারলেন সহদেব।

এইভাবে একশ' ভাই আর তাদের সাথী— সবগুলো পাপীই শেষ হয়ে গেলো। ভালো মানুষও যে কিছু না মরলো তা নয়। কি আর করা যায়! এ এড়িয়ে যাওয়া চলে না এসব কাজে।

কত লোক যে এ লড়াইতে মরেছিল তা বলে শেষ করা যায় না। আঠারো দিন ধরে এ লড়াই চলেছিল। মানুষের রক্তে লড়াইয়ের মাঠে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। তাতে আবার ঢেউও উঠেছিল।

পাপীগুলো মারা যাওয়ায় দেশ বাঁচলো, দেশের মানুষ বাঁচলো। এরপর পানডবেরা দু' অংশেরই রাজা হলেন।

—নয়—

লড়াইতে জিতবার পর যুধিষ্ঠির ভাবলেন সারা ভারতকে এক শাসনের অধীনে আনতে হবে। একটা বড় ভারত তৈরী করতে হবে। তাই হবে মহাভারত। তা হলে আর এ দেশে পাপীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

এই না ভেবে তিনি একটা যাগ করবেন ঠিক করলেন। সেই যাগে দেশের ছোট বড় সব রাজাকেই যোগ দিতে বলবেন। এ কথাটাও তখন তাদের জানিয়ে দেবেন।

ঠিক সেই মতই যাগের সব ঠিকঠাক হলো। ভারতের সব রাজাই এসে সেই যাগে যোগ দিলেন। যুধিষ্ঠির যা ঠিক করেছিলেন তা ওদের বললেন। তারা যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে বললেন—এর চেয়ে ভালো কথা আর কি হতে পারে! আপনার মত সাধু লোক সারা ভারতের রাজাদের ভেতর আর

কেউ নেই। আমরা সবাই আপনার কথা মেনে চলবো। আপনিই হবেন মহাভারতের নেতা।

ভগবান নিজে পাপীদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে সাধুদের বাঁচাবেন ঠিক করেছিলেন। দুনিয়া যখন পাপে ডুবে যায় তখন তিনি এমনিই করেন কি না! তিনি মানুষ হয়ে এ দুনিয়ায় আসেন। এবারও তিনি তাই করলেন। নারায়ণ হয়ে এলেন। আর পানডবদের সহায়তা করলেন এই লড়াইতে। আরও একটা বড় ফল এই লড়াইয়ের হলো। সারা ভারত এক শাসনের অধীনে এসে মহাভারত তৈরী হলো।

—দশ—

এরপরও যুধিষঠির কিছুকাল শাসনের কাজ চালালেন। তারপর তিনি এসব কাজ আর করতে চাইলেন না। লড়াইতে তাঁর অনেক আপনার লোক মারা যাওয়ায় তাঁর মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর এক নাতিকে শাসন-

ভার বুঝিয়ে দিয়ে হিমালয়ের ওপর দিয়ে দেবলোকে চলে গেলেন।

দেবলোকে ঢোকবার আগে দেবতারা নানাভাবে যুধিষ্ঠিরকে পরখ করে দেখলেন, ঠিক ঠিকই তিনি সাধু কি না, তিনি দেবলোকে জায়গা পাবার মত মানুষ কি না! সেখানে তাঁর সাথে নারায়ণের দেখা হলো।

মহাভারতের কথা হৈল সমাপন।
পাইবে পরম সুখ শুন দিয়া মন॥

—শেষ—